International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VII, Issue-III, May 2021, Page No. 13-18
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v7.i3.2021.13-18

বৌদ্ধদর্শনে কর্ম ও বিপাক : একটি সমীক্ষা

Dr Debabrata saha
Associate Professor of Philosophy, Kazi Nazrul University, Asansol

Abstract

Regarding karma and karmaphala it may be said that one must enjoy karmaphala only if he does karma. These karma and karmaphala are related to cause and effect. The origin of karma is mind (consciousness) and the consequence of karma is rebirth. karma is an inherent force; karma is transmitted from one birth to another. karma affects a person's disposition from birth to rebirth. The karma is not stored anywhere but it is initiated on the basis of the body and bears karmaphala at the appropriate moment. This article discusses how karma is generated and how karmaphala is applied in the light of Buddhist philosophy. In this regard this article also tries to highlight Gautama and Dhammapadas discussion regarding the problems of life and reality from a practical and ethical point of view.

আয়ু-বর্ণ, ভোগ-ঐশ্বর্য এবং জ্ঞান-গরিমায় মানুষের মধ্যে পার্থক্যের অন্যতম কারণ হল কর্ম। প্রত্যেকটি জীবই নিজ নিজ কর্মের অধীন। কর্মই জীবসকলকে নানাভাবে বিভাজন করে। কেউ জন্মগ্রহণ করে প্রাচুর্যের মধ্যে আবার কেউ জন্মগ্রহণ করে নিদারুণ দারিদ্রের মধ্যে। কেউ মহাজ্ঞানী আবার কেউ মুর্খ। কেউ আবার জন্ম থেকেই প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন, ভাষাবিদ, শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ আবার কেউ জন্ম থেকেই অন্ধ, বধির ও বিকৃতাঙ্গযুক্ত। এই সব বৈষম্যের মূলে কি নির্দিষ্ট কোন কারণ বা হেতু আছে? যদি না থাকে তাহলে এই সকল বৈষম্য কি কেবল আকস্মিক ঘটনা মাত্র? কোন যুক্তিবাদী ব্যক্তিই একে আকস্মিক ঘটনা বলে মেনে নেবেন না। তবে অনেকেই আছেন যারা মনে করেন ঈশ্বরের ইচ্ছাই এই সব বৈষম্যের কারণ। এখানে বিজ্ঞানীরা বলতে পারেন যে, বৈষম্যের কারণ জিন্‌গত। জিন্‌ই বর্ণ, উচ্চতা, ওজন, দেহের ক্রমবৃদ্ধি, দীর্ঘায়ু, সাহস, ভীরুতার কারণ। এমনকি ব্যক্তির মানসিকতাও অনেকটা জিন্‌গত। কিন্তু প্রশ্ন হল জিন্‌ এক হলেও ব্যক্তির মধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বা স্থূল বৈষম্য দেখা যায় কেন? যেমন যমজ সন্তানের ক্ষেত্রে বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। রূপে, গুণে, জ্ঞানে, স্বভাবে, চরিত্রে দুই যমজ সহোদরের মধ্যেও দৈহিক, চারিত্রিক ও বুদ্ধিবৃত্তির যে বৈষম্য দেখা যায় তা কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে বোঝানো সম্ভব নয়। এই বৈষম্য জিন্‌গত কারণে হতে পারে না। সম্ভ্রান্ত বংশের দীর্ঘ জন্ম-পরম্পরায় হঠাৎ এক অপরাধীর এবং হীন কুলে সৎ-পুরুষ, অদ্ভুত শিশু, প্রতিভাধর ব্যক্তির উৎপত্তির কারণ বিজ্ঞানীরা ব্যাখ্যা করতে অসমর্থ। বৌদ্ধদর্শনে, এর পার্থক্য হল আমাদের অতীত ও বর্তমান কর্মের ফল। আমরা নিজেরাই আমাদের সুখ এবং দুঃখের জন্য দায়ী। আমরা নিজেরাই আমাদের স্বর্গ-নরকের স্রষ্টা। আমরাই আমাদের নিজেদের কর্মের প্রতীক। যদিও বিভিন্ন বৈষম্যের কারণ কর্ম, তথাপি ইহা স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত হবে না যে সকল কিছুই কর্ম

নিয়ন্ত্রিত। কারণ, পূর্বকর্মই যদি মানুষের সমস্ত কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করতো তাহলে মানুষ রোগ নিরাময়ের জন্য চিকিৎসকের কাছে যেতেন না। আবার মানুষ তাঁর বর্তমান ও ভবিষ্যতকে শুদ্ধ করার চেষ্টাও করতেন না। আবার স্বাধীন ইচ্ছা বলেও কিছু থাকতো না।

কর্ম অদৃষ্ট যেমন নয়, তেমনই পূর্ব নির্ধারিত বিধানও নয়, যা কোন রহস্যময় শক্তি আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে, যার কাছে আমাদের অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে। মানুষ তার ভাল মন্দ কর্মের ফলস্বরূপ স্বাভাবিক ভাবেই সুখ, দুঃখ ভোগ করে থাকে। উপযুক্ত ফল প্রসবই কর্মের অন্তর্নিহিত শক্তি। কর্ম ফল প্রদান করে আর ফল কারণ নির্দেশ করে। কর্ম ও কর্মফল পরস্পর সম্পর্কে জড়িত। ফলই পূর্ব থেকে কর্মের মধ্যে অঙ্কুররূপে বর্তমান থাকে। কর্মের অনুসিদ্ধান্ত হল পুনর্জন্ম। কর্ম ও পূনর্জন্ম পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। প্রাক্‌বুদ্ধযুগেও কর্ম ও পূনর্জন্মের ধ্যান-ধারণা প্রচলিত থাকলেও বুদ্ধই সর্বপ্রথম কর্ম ও পূনর্জন্মের যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

সাধারণভাবে কর্ম দুই প্রকার যথা, চেতনা ও চেতয়িত্বা। চেতনা হল মানস কর্ম আর চেতনা থেকে যে কর্ম উৎপন্ন হয় তা হল চেতনাকৃত অর্থাৎ চেতয়িত্বা কর্ম। এই চেতয়িত্বা কর্ম আবার দুই প্রকার, যথা, কায়িক ও বাচিক। তাই দৈহিক, মৌখিক এবং মানসিক যে কোন ইচ্ছাকৃত ক্রিয়া বা কার্যকে কর্ম বলা হয়। কর্ম শব্দটি ‘কৃ’ ধাতু থেকে উদ্ভব, যার অর্থ হল কাজ করা। সবরকম কাজই কর্ম। এদিক থেকে কর্ম দুই প্রকার, যথা, কৃতকর্ম ও উপচিত কর্ম। সকল উপচিত কর্মই কৃতকর্ম কিন্তু সকল কৃতকর্মই উপচিত কর্ম নয়। স্বেচ্ছায় বা বুদ্ধিপূর্বক যে কর্ম করা হয় তাই-ই উপচিত কর্ম। জীবের বুদ্ধিপূর্বক উপচিত কর্মই তাঁর স্বাধীনতার নিয়ন্ত্রক। বৌদ্ধদর্শনে, কর্ম যান্ত্রিক নয়। কর্মকে যান্ত্রিক বললে জীবের স্বাধীনতা থাকে না। কর্ম ও কর্মফল কার্য-কারণ সম্বন্ধে আবদ্ধ। কর্ম হল কারণ, আর কর্মফল হল কার্য। এই সম্বন্ধ আদি-অন্তহীন। যেহেতু কর্ম ও কর্মফল কার্য-কারণ সম্বন্ধে আবদ্ধ সেহেতু প্রতীত্যসমুৎপন্ন। সাধারণতঃ ভাল এবং মন্দ যে কোন ক্রিয়ার নামই কর্ম। পারমার্থিক ভাষায় সকল প্রকার কুশল এবং অকুশল চেতনাই কর্ম। কেননা, চেতনার দ্বারা ব্যক্তি কায়-বাক্য-মনের দ্বারা কর্ম সম্পাদন করে।

পঞ্চেন্দ্রিয় এবং মনের সঙ্গে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ এবং ভাবের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। যেমন, চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে রূপের সংযোগে চক্ষু-বিজ্ঞান বা চিত্ত উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে চক্ষু, রূপ ও বিজ্ঞান—এ তিনের যখন সংস্পর্শ হয় তখন সুখ, দুঃখ কিংবা উপেক্ষানুভূতি-সূচক বেদনার উদ্রেক হয়। এই সময় বিজ্ঞান বা চিত্ত যদি রূপ-সংযোগকে সুন্দর, শুভ সুখ রূপে দর্শন করে তাহলে ‘সুখবেদনা’ উৎপন্ন হয়, আর যদি রূপ-সংযোগে কুৎসিত, কদাকার ও অমনোজ্ঞ রূপে অনুভূত হয় তাহলে ‘দুঃখবেদনা’ উৎপন্ন হয়, আর চিত্ত যখন বিষয় বস্তুকে সুন্দর-অসুন্দর, শুভাশুভ, মনোজ্ঞ-অমনোজ্ঞ কোন নির্দিষ্ট রূপে গ্রহণ করে না, বিষয় বস্তু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবচেতন থাকে তখন ‘উপেক্ষাবেদনা’ উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে সকল ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে সমতুল্য। সুখবেদনা থেকে লোভের, দুঃখবেদনা থেকে দ্বেষের এবং উপেক্ষাবেদনা থেকে অজ্ঞানতার সৃষ্টি হয়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সমূহ ও বাহ্য রূপাদির সঙ্গে সংযোগ ঘটলে মন স্পন্দিত ও আলোড়িত হয়, ফলে তার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে মনকর্ম, বাক্‌কর্ম ও কায়কর্ম সম্পাদিত হয়। এরফলে চিত্তপ্রবাহের মধ্যে একটা চাপ পড়ে, সেই চাপে যেই কর্মশক্তি ব্যয়িত হয় তা দম দেওয়া ঘড়ির স্প্রিং-এর ন্যায় সেই ব্যয়িত শক্তি প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে এবং সেই কর্মশক্তিই উপযুক্ত ও অনুকূল সুযোগ সুবিধা লাভ করে জন্ম, জরা, আয়ু ও ভোগাকারে ক্রমাগত প্রকাশিত হয়ে ফল প্রদান করতে থাকে। সেই প্রকাশমান অবস্থাই হল বিপাক বা ফল।

প্রত্যেক বস্তুর যেমন ছায়া আছে এবং ছায়া সেই বস্তুকে সবসময় অনুসরণ করে, সেইরূপ কর্ম-বিপাক কর্মকে অনুসরণ করে। কর্ম যদি ভাল-মন্দ হয় তাহলে বিপাকও ভাল-মন্দ হয়। কর্মের উৎপত্তিস্থল মন (চেতনা) অতএব

কর্মফলের উৎপত্তিস্থলও মন। কর্ম করলে তার ফল ভোগ করতেই হবে যে কোন সময়ে, যে কোন স্থানে, এইজন্মে হোক বা পরজন্মে। কর্ম হল একটি স্বকীয় শক্তি, এক জন্ম থেকে অন্য জন্মে কর্ম সংক্রামিত হয়। কর্ম জন্ম-জন্মান্তরে ব্যক্তির স্বভাবকে প্রভাবিত করে। ক্ষণ পরিবর্তনশীল নামরূপের মধ্যে কর্ম কোথাও সঞ্চিত থাকে না। কিন্তু নামরূপকে ভিত্তি করেই কর্ম প্রবর্তিত হয় এবং উপযুক্ত মুহূর্তে ফল প্রসব করে। যেমন আম্রফল আম্রবৃক্ষের কোথাও লুকিয়ে থাকে না, আম্রবৃক্ষকেই ভিত্তি করে এর অবস্থিতি এবং যথাসময়ে ফলাকারে এর আবির্ভাব হয়। বিপাক বা ফলপ্রাপ্তি হিসাবে কর্ম চার প্রকার- ১) দৃষ্টধর্মবেদনীয় কর্ম, ২) উপপদ্য-বেদনীয় কর্ম, ৩) অপরপর্যায়বেদনীয় কর্ম এবং ৪) অহোসি কর্ম বা ভূতপূর্ববেদনীয় কর্ম।

দৃষ্টধর্মবেদনীয় কর্ম— এইজন্মে কৃত যে কর্মের ফল এইজন্মেই ফলদায়ক হয় তাই দৃষ্টধর্মবেদনীয় কর্ম। অর্থাৎ বর্তমান জীবন পরিচালনা করতে গিয়ে যে কর্মের বেড়াজালে আবদ্ধ হয় সেই কর্মের ফল বর্তমান জীবন পরিচালনায় ভোগ করে, কিন্তু কোন কারণে যদি অর্থাৎ বিরুদ্ধ কর্মশক্তি দ্বারা প্রতিহত হয়ে এইজন্মে ফলদান না করে তবে তা অহোসি কর্ম বা ভূতপূর্ব ক্রমে পরিণত হয়।

উপপদ্য-বেদনীয় কর্ম— জীবের যে সকল কর্ম এই জীবনে সম্পাদিত হয়ে অব্যবহিত পরবর্তী জীবনে অনুভবনীয় হয় অর্থাৎ যার বিপাক পরবর্তীকালে ফলদান করে তাই উপপদ্য-বেদনীয় কর্ম। পরবর্তী জন্মেও যদি ফলপ্রদানের অবকাশ না পায়, বিরুদ্ধ শক্তি দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহলে তা অহোসি কর্ম বা ভূতপূর্ব কর্মে পরিণত হয়।

অপরপর্যায়বেদনীয় কর্ম— পরবর্তী দ্বিতীয় জন্ম থেকে যে কোন ফল অনুভবনীয়। এই কর্ম নির্বাণ লাভ না হওয়া পর্যন্ত যে কোন সময়ে ফল প্রদান করে। এইজন্য এই কর্মকে অপরপর্যায়বেদনীয় কর্ম বলে। এমনকি বুদ্ধ এবং অর্হৎগণও তাঁদের জীবন প্রবর্তন কালে এইরূপ কর্মের ফল ভোগ করেছেন। এই কর্ম থেকে কেউই নিস্কৃতি পায় না। এ প্রসঙ্গে ধম্মপদে উল্লেখ আছে যে, 'ন অন্তলিক্খে ন সমুদ্দমজ্ঝো ন পব্বতানং বিবরং পবিস্স, ন বিজ্জতি সো জগতিপ্পদেসো যত্থট্ঠিতো মুঞ্চে য্য পাপকম্মা'।[1] অর্থাৎ অন্তরীক্ষে, সমুদ্র মধ্যে কিংবা পর্ব্বত-বিবরে, জগতে এমন কোন স্থান বর্তমান নেই, যেখানে অবস্থান করলে পাপকর্মের ফল থেকে নিজেকে মুক্ত করা যায়। এই সকল কর্ম আপন বলবত্তায় ভবিষ্যতে যখনই অবকাশ লাভ করে তখনই ফলদান করে। সম্ভবতঃ এ জাতীয় কর্মকে লক্ষ্য করেই মহাভারতে উক্ত হয়েছে যে, 'যথা ধেনু সহস্রেসু বৎসো বিন্দতি মাতরম্, তথা পূর্ব্ব কৃতং কর্ম কর্ত্তার মনু গচ্ছতি'।[2] অর্থাৎ যেমন সহস্র ধেনুর মধ্যেও বৎস আপন মাতাকে বেছে নেই, তেমনি পূর্বকৃত কর্ম অসংখ্য জীবগণের মধ্যে কর্তাকে অনুসরণ করে। কর্ম বিপাক দান করবেই, এ জাতীয় কর্মের হাত থেকে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। এ প্রসঙ্গে ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত গ্রন্থে প্রতিধ্বনিত হয়েছে যে, 'অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং, শুভাশুভং চ যৎ কর্ম্ম বিনা ভোগাৎ ন তৎক্ষয়'।[3] ভোগ ছাড়া কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। ভোগেই এর পরিসমাপ্তি।

অহোসি কর্ম বা ভূতপূর্ববেদনীয় কর্ম— যে কর্মের ফল প্রদান শক্তি এক সময় ছিল এখন তা ক্ষীণবীজ হয়েছে। যে কোন কারণেই হোক, যে কর্ম এইজন্মে বা পরজন্মে ফলপ্রদানে অক্ষম তাই অহোসি কর্ম বা ভূতপূর্ব কর্ম। 'অহোসি' অর্থ হল এক সময় ফল উৎপাদনের শক্তি ছিল কিন্তু বিরুদ্ধ শক্তি দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ফল উৎপাদনের

---

[1] ধম্মপদ ১২৭

[2] মহাভারত, শান্তিপর্ব ১৮১/১৬

[3] ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত, কৃষ্ণজন্ম খণ্ড, ৮৪

শক্তি হারিয়েছে। পূর্ব্বোক্ত অপরপর্যায়বেদনীয় কর্ম ব্যতীত সকল প্রকার কর্ম যথাসময়ে ফল উৎপাদনে ব্যার্থ হলে অহোসি কর্মে পরিণত হয়।

আবার ফল প্রদানের স্থান হিসাবে কর্ম চার প্রকার, যথা, ১) অকুশল, ২) কামাচার ফল প্রদানকারী কুশল কর্ম, ৩) রূপাবচর ফল প্রদানকারী কুশল কর্ম এবং ৪) অরূপাবচর ফল প্রদানকারী কুশল কর্ম। যে পাপকর্ম জীবগণকে মৃত্যুর পর চার প্রকার কাম দুর্গতিতে (অর্থাৎ অসুর, প্রেত, তির্যক ও নিরয়) নিক্ষেপ করে সে সব কর্মকে অকুশল কর্ম বলে। আর মৃত্যুর পর যে সব কর্মের প্রভাবে কাম সুগতি ভূমিতে জন্ম গ্রহণ করতে পারে সে সব কুশল ফল প্রদানকারী কর্মকে কামাবচর ফল প্রদানকারী কুশল কর্ম বলে। আর মৃত্যুর পর যে সব কর্ম জীবগণকে রূপলোকের ষোলটি ভূমিতে জন্ম ধারণের ফল প্রদান করতে সক্ষম তাকেই রূপাবচর ফল প্রদানকারী কুশল কর্ম বলে। আর যে সব সৎ কর্ম অরূপলোকের চারটি ভূমিতে জীবগণকে জন্ম গ্রহণ করতে ফল প্রদানে সক্ষম তাকে অরূপাবচর ফল প্রদানকারী কুশল কর্ম বলে।

জন্ম-জন্মান্তরে জীব কুশল-অকুশল হিতাহিত, ক্ষুদ্র-বৃহৎ ইত্যাদি অসংখ্য কর্ম সম্পাদন করে। তার মধ্যে বহু বিরুদ্ধ কর্ম শক্তির প্রভাবে প্রতিহত হয়। আবার বহু কর্ম শক্তি সংস্কার রূপে চিত্তপ্রবাহে সঞ্চিত থাকে। আবার কতকগুলিতে কর্মের ভোগ চলতে থাকে, আর কতকগুলিতে কর্ম ফলনোন্মুখ হয়। তাই কৃত্য ভেদে কর্ম আবার আট প্রকার যথা – ১) জনক কর্ম, ২) উপস্তম্ভক কর্ম, ৩) উপপীড়ক কর্ম, ৪) উপঘাতক কর্ম, ৫) গ্রুক (গুরু) কর্ম, ৬) আসন্ন বা মরণাসন্ন কর্ম, ৭) আচরিত কর্ম এবং ৮) কৃতত্ব বা সঞ্চিত কর্ম।

জনক কর্ম– প্রত্যেক জন্ম পূর্বকৃত কুশল বা অকুশল কর্ম দ্বারা প্রভাবিত যা মৃত্যুক্ষণে আধিপত্য করে। এইভাবে যে কর্ম ভবিষ্যত জন্ম নিরূপণ করে (বা প্রভাবিত করে) তাকে জনক কর্ম বলা হয়। ব্যক্তির মৃত্যু কেবলমাত্র সাময়িক ঘটনার সাময়িক বিরতি। মৃত্যক্ষণে চিত্তে যে কর্মশক্তির ফলদায়ক কম্পন সৃষ্টি হয় তাই জীবনপ্রবাহকে বাঁচিয়ে রাখে এবং পরবর্তী জন্ম সৃষ্টি করে। এটাই কোন এক জন্মের সর্বশেষ চিত্ত যাকে সাধারণতঃ জনক কর্ম বলা হয়। জনক কর্ম গর্ভধারণক্ষণে চিত্তস্কন্ধ ও রূপ্সকন্ধ উৎপন্ন করে। প্রথম যে চিত্তোৎপত্তি হয় তাকে প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান বলা হয়। এই প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান জনক কর্ম দ্বারা প্রভাবিত। মাতৃগর্ভে প্রতিসন্ধি বিজ্ঞানের উৎপত্তির সাথে সাথে কায়দশক, ভাবদশক এবং বাস্তুদশক উৎপন্ন হয়। কায়দশক উৎপত্তির উপকরণ হল চারটি ধাতু, যথা, পৃথিবী ধাতু (যা বিস্তৃতি ঘটায়), অপধাতু (যা সংসক্তি ঘটায়), তেজধাতু (যা উষ্ণতা উৎপন্ন করে) এবং বায়ুধাতু (যা গতি সৃষ্টি করে)। ভাবদশক উৎপত্তির উপকরণ হল স্ত্রী বা পুংভাব। আর বাস্তদশক উৎপত্তির উপকরণ হল চিত্তস্থান। এর থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে, স্ত্রীভাব বা পুংভাব গর্ভধারণের সঙ্গে সঙ্গেই নির্ধারিত হয়।

উপস্তম্ভক কর্ম– যে কর্ম জনক কর্মের নিকটবর্তী হয়ে একে প্রতিপোষণ করে তাকে বলা হয় উপস্তম্ভক কর্ম। এই কর্ম কুশলও হতে পারে আবার অকুশলও হতে পারে। তবে জীবন প্রবর্তনকালে এই কর্ম জনক কর্মকে সাহায্য করে বা রক্ষা করে। গর্ভধারণের ক্ষণ থেকে জীবনের অবসান পর্যন্ত এই উপস্তম্ভক কর্ম জনক কর্মকে প্রতিপোষণ করে চলে। কুশল উপস্তম্ভক কর্ম সুস্বাস্থ্য, ধন, সুখ ইত্যাদি দ্বারা ব্যক্তিকে সাহায্য করে। আর অকুশল উপস্তম্ভক কর্ম অকুশল জনক কর্ম প্রভাবে ব্যক্তিকে দুঃখ, কষ্ট ইত্যাদি দিয়ে থাকে। যেমন, ভারবাহী পশু এবং পশুবৎ ভারবাহী মানুষ।

উপপীড়ক কর্ম– এই কর্ম বাধাদানকারী বা উৎপীড়নকারী কর্ম। এই কর্ম জনক কর্মকে দুর্বল করে এবং জনক কর্মের ফলপ্রদানে বাধা দিয়ে থাকে ও ব্যতিক্রম ঘটায়। যেমন, এক ব্যক্তি কুশল জনক কর্ম প্রবাহে জন্মগ্রহণ করলেও উপপীড়ক কর্ম প্রভাবে তাকে নানা দুঃখ, পীড়া, মনঃকষ্ট ইত্যাদি দ্বারা উত্যক্ত হতে হয়। এইভাবে

ব্যক্তিকে তার কুশল জনক কর্মের সুখময় ফলভোগে বাধা জন্মায়। আবার একটি পশু অকুশল জনক কর্ম প্রভাবে পশু যোনিতে জন্মগ্রহণ করেও ভাল খাদ্য, ভাল বাসস্থান ইত্যাদি লাভ করে সুখ ভোগ করে। এইভাবে উপপীড়ক কর্ম অকুশল জনক কর্মকে ফল প্রদানে বাধা দান করে।

উপঘাতক কর্ম– এই কর্ম উপস্তম্ভক এবং উপপীড়ক কর্ম অপেক্ষাও শক্তিশালী। তাই এই কর্ম কেবল বাধা প্রদান করেও ক্ষান্ত হয় না, জনক কর্মের শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসও করে। উপঘাতক কর্ম বিরুদ্ধ কর্মকে সমূলে উৎপাটন করে আপন আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা করে নিরস্ত হয়। যেমন, কোন শিক্ষার্থী দুরারোগ্য ব্যাধীতে আক্রান্ত হয়ে তার পড়াশোনা বন্ধ করতে বাধ্য হলো, এই জীবনে পড়াশোনা আরম্ভ করা তার পক্ষে আর সম্ভব হলো না, ক্রমশঃ রোগ বৃদ্ধি হয়ে জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল। এই দুরারোগ্য ব্যাধি শিক্ষার্থীর পড়াশোনা ও জীবনের পক্ষে উপঘাতক। এই কর্মও কুশল ফলপ্রদ এবং অকুশল ফলপ্রদ উভয় প্রকারের হতে পারে।

গুরুক (গুরু) কর্ম– গুরুতর বা শক্তিশালী কর্মই গুরু কর্ম। এই কর্ম কুশল-অকুশল দুই-ই হতে পারে। এই কর্ম এইজন্মেও ফলপ্রদান করতে পারে অথবা পরজন্মে ফল দান করবেই। অর্থাৎ এই সকল কর্মের ফল অনিবার্যরূপে পরজন্মে ভোগ করতেই হবে।

আসন্ন বা মরণাসন্ন কর্ম— যে কর্ম কোন ব্যক্তি মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বক্ষণে সম্পন্ন করেন বা জীবনে কৃত, পুণ্যকর্মের কথা স্মরণ করেন তাকে মরণাসন্ন কর্ম বলা হয়।

আচরিত কর্ম– যে কর্মের প্রতি ব্যক্তির অনুরাগ থাকে এবং অভ্যাসবশতঃ তা পুনঃ পুনঃ সম্পাদন করে ও স্মরণ করে তাকে আচরিত কর্ম বলে। গুরু ও আসন্ন কর্মের অভাবে এই আচরিত কর্মই অনন্তর জন্মে অর্থাৎ অব্যবহিত পর জন্মে জন্মরূপ বিপাক দান করে।

কৃতত্ব বা সঞ্চিত কর্ম– যে কর্ম কৃত হয়েছে অথচ বিস্মৃত হয়েছে তাই কৃতত্ব কর্ম। জন্ম জন্মান্তর ধরে কৃত কর্মবীজ ব্যক্তির চিত্ত ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকে। অনেকক্ষেত্রে ব্যক্তির স্মরণ পথে সেইগুলি উদিত হয় না।

বৌদ্ধদর্শনে চিত্ত বা চেতনাই হল কুশল কর্ম এবং অকুশল কর্মের উৎপত্তিস্থল। কুশল চেতনার মাধ্যমে কুশল কর্ম সম্পাদিত হয় আর অকুশল চেতনার মাধ্যমে অকুশল কর্ম সম্পাদিত হয়। তাই কুশল কর্মের জন্য মনের সংযতকরণ প্রয়োজন। ধম্মপদে এবিষয়ে বলা হয়েছে, ‘মনোপুব্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্ঠা মনোময়া, মনসা চে পদুট্ঠেন ভাসতি বা করোতি বা, ততো নং দুক্খমন্বেতি চক্কং ব বহতো পদং’।[4] অর্থাৎ মন বেদনাদি ধর্মসমূহের পূর্বগামী, মনই ধর্মসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (প্রধান), এবং ধর্ম মনোময় (অর্থাৎ ধর্ম মন থেকেই উৎপন্ন হয়)। মানুষের স্বভাব বা চিন্তা মনের দ্বারাই অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত হয়। জীবের চৈতসিক ভাবসমূহ মন থেকেই উৎপন্ন হয় ও মনের স্বভাব প্রাপ্ত হয়। যদি কেউ দূষিতান্তঃকরণে কথা বলে, বা কার্য করে তবে চক্র যেমন ভারবাহী বলদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে—দুঃখও তাকে সেইরূপ অনুসরণ করে।

এর থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে, কর্ম দ্বারা সমাজে মানুষের অবস্থান সুদৃঢ় হয় কিংবা প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব হয়, জন্ম দিয়ে নয়। সুন্দর এবং সুষ্ঠুভাবে প্রত্যেকদিনের কর্ম সম্পাদন করলে জীবন সুখময় হয়। তবে সম্পাদিত কর্মের মধ্যে কুশল চেতনা থাকা আবশ্যক। কর্মই মানুষের চালিকা শক্তি। মানুষ নিজেই নিজের কর্মফল বহন করে।

[4] ধম্মপদ, ১

'যেমন কর্ম তেমন ফল' এটাই কর্ম নিয়ম। তবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কর্মফলের তারতম্য ঘটে অর্থাৎ যতটা কর্মবীজ ততটা ফলপ্রাপ্তি হয় না। ফলপ্রাপ্তির পরিমাণ কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে। কারণ, বীজ অনুসারে ফলপ্রাপ্তি স্বীকার করলে ধর্মীয় জীবন যাপন, সদাচরণ, পুণ্যক্রিয়া, অনুষ্ঠান ইত্যাদি মিথ্যা হয়ে যায়। কর্মের দ্বারা মানুষ সর্বদুঃখ থেকে মুক্তি পেতে পারে - এ কথাও মিথ্যা হয়ে যায়। তাই বৌদ্ধ দর্শনে শিক্ষা দেওয়া হয় যে, মানুষ সৎ চেষ্টার দ্বারা তার পূর্বকৃত কর্মের ফলকে পরিবর্তিত করতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, মহাপাপী ব্যক্তিও সৎচেষ্টার দ্বারা মহাপুণ্যবান হয়েছে। সেই কারণেই হয়তো যীশু শিক্ষা দিয়েছেন— পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়। তাই কোন ব্যক্তি তার কৃতকর্মের দাসও নয় আবার প্রভুও নয়। চেষ্টার দ্বারা মানুষ কর্মকেই দাসে পরিণত করতে পারে। তাই পূর্বপূর্বকৃত কর্ম ফল অনেক ক্ষেত্রেই অবস্থা, পরিবেশ, ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারা প্রভাবিত হয়। যখন জীবনে কোন অঘটন ঘটে, দুঃখ দুর্দশা আসে, ব্যর্থতা আসে তখন তিনি মনে করেন কৃতকর্মেরই ফল ভোগ করছেন এবং পূর্বের ঋণের বোঝা কিছুটা কমিয়ে ফেলছেন। এই ভাবনাই তাকে কর্মতৎপর করে এবং তার উৎসাহকে উদ্দীপিত করে। যদি কোন রোগী তাঁর রোগ নিরাময়ের জন্য উদ্যোগী না হয়, যদি কোন দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি তাঁর দুর্দশা থেকে অব্যহতি লাভের চেষ্টা না করে, যদি কেউ তাঁর উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য চেষ্টা না করে তাহলে তাঁর পূর্বকৃত পাপকর্ম অশুভ ফল প্রদানের জন্য সুযোগের সন্ধান করবে। অন্যদিকে যদি কেউ তাঁর দুঃখ-দুর্দশা নিরোধের জন্য উদ্যোগী হয়, তাঁর অবস্থার উন্নতির জন্য সে চেষ্টা করে, তাঁর শ্রীবৃদ্ধির জন্য সে নিরলসভাবে পরিশ্রম করে তাহলে তাঁর পূর্বকৃত কুশল কর্ম কুশল ফল প্রদানের জন্য সুযোগের সন্ধান করবে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, প্রচেষ্টা এবং অকর্মণ্যতা শুভাশুভ কর্মফলকে নিয়ন্ত্রণ করে। কঠোর প্রচেষ্টার দ্বারা কেউ কেউ নতুন কর্ম সৃষ্টি করে তার নিজের পরিবেশ এবং নিজের জগতকে আমূল পরিবর্তন করতে পারে। আবার কেউ সুবর্ণ সুযোগের অধিকারী হয়েও অকর্মণ্যতার কারণে নিজের সকল সুযোগ হারিয়ে ফেলে এবং ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তাই বলা যায় কর্মের দ্বারাই কর্ম শূন্য হওয়া যায়।

সহায়ক গ্রন্থ:

1. মণ্ডল, প্রদ্যোত কুমার: ভারতীয় দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৮।
2. মহাপরিনিব্বান সুত্তং, রাজগুরু শ্রীধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির কর্তৃক সঙ্কলিত ও অনূদিত, মহাবোধি বুক এজেন্সি, প্রথম প্রকাশ ১৯৪১।
3. মহাস্থবির, আচার্য্য বিশুদ্ধানন্দ, বৌদ্ধদর্শনে সত্য-দর্শন, মহাবোধি বুক এজেন্সি কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৩।
4. শাস্ত্রী, পঞ্চানন, বৌদ্ধ-দর্শনম্, গুপ্তপ্রেস, কলকাতা, ১৪০১ বঙ্গাব্দ।
5. হালদার (দে), ডঃ মণিকুন্তলা, বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, মহাবোধি বুক এজেন্সি, প্রথম প্রকাশ, মাঘী পূর্ণিমা, ১৪০২।
6. Dhammapada, Text and Trans., Thera Acharya Buddharakkhita, Buddha Vacana Trust Maha Bodhi Society, Bangalore, 1st Edition 4th may 1996.
7. Dusgupta, S.N., A History of Indian Philosophy, Cambridge University Press, Vol. I, 1969
8. Sharma, C. D., A Critical Survey of Indian Philosophy, Motilal Banarsidass, 1976, 1st Publication 1960.